বহু মতের মধ্যে শৈল্পিক সমন্বয়

ড. ইয়াসির ক্বাদি

ড. তারিক রামাদান

ড. ইয়াসির ক্বাদির বক্তব্য

আজকের আলোচ্য বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর ও কঠিন। এটি এমন একটি বিষয়, যাতে জড়িয়ে আছে আবেগ। যাতে রয়েছে আমাদের সকলের খুব মজবুত ও আবেগপূর্ণ মতামত। তাই আমরা সকলকে খোলা মন নিয়ে, ভিন্নমতকে শোনার উদারতা নিয়ে আলোচনাটি শোনার আহ্বান করছি। আর আমি যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছি ও কাজ করছি, তার প্রতিও লক্ষ রাখার অনুরোধ করছি। এই বিষয়ে আমরা দুজন আলোচনা করব; ড. তারিক রামাদান আমার পর সম্পূরক আলোচনা রাখবেন। আমার আলোচনার বিষয় হলো, রাসূল সা.-এর একটি বিখ্যাত হাদিসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা– রাসূলুল্লাহ সা. ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন, **"আমার উম্মাহ ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে।"**

আমরা হাদিসটিকে কীভাবে বুঝব আর এর ভিত্তিতে আমাদের করণীয় কী হবে– সে সম্পর্কেও খোলামেলা আলোচনা করব। মূল আলোচনা শুরুর আগে একটা পয়েন্ট স্পষ্ট করা প্রয়োজন বোধ করছি; আমি একজন থিওলজি তথা ধর্মতত্ত্বের ছাত্র। আমার বিশেষ অধ্যয়নের বিষয় হলো ইসলামি থিওলজি। আমার মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি– সবকিছুই ইসলামি থিওলজির[১] ওপর। এটা কিছুটা হতাশাজনক, মাঝে মাঝে কিছু লোক আমার সমগ্র জগৎ; পড়াশোনা ও দক্ষতার জায়গাটিকে শুধুই সময় নষ্ট করা বলে বাতিল করে দিতে চায়। তারা বলে, কে থিওলজিতে মনোযোগ দেয়? আপনি কি বিশ্বাস করেন, সেটাকে কে পাত্তা দেয়? এটা বিভক্তিকারী বিষয়, এটা বিভক্তির উদ্রেক করে। এর দ্বারা মূলত আমাকে ব্যক্তিগতভাবে হেয় করা হয়। কারণ, আমি আমার সমগ্র জীবনকে ইসলামি থিওলজি অধ্যয়নে উৎসর্গ করেছি। সুতরাং প্রথমত আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই, আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড যাহোক না কেন, ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাস যাহোক না কেন, সবাই জানেন যে, আমরা প্রায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বিষয়ে সীমাতিক্রম করছি।

আমি আপনাদের একটি অকাট্য উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের উম্মাহর ইতিহাসে একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রুপ ছিল, যাদের বর্তমানে কোনো অস্তিত্ব নেই। তারা বিশ্বাস করতো, আল্লাহ পৃথিবীতে নেমে এসে সম্প্রদায়ের কিছু বিশেষ নেতার মাঝে অবস্থান করেন। সোজাসুজি বললে, লোকটি জমিনে হাঁটছে মানে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে বিচরণ করছেন– এটা তাদের বিশ্বাস।

আমরা আমাদের থিওলজি ও ইতিহাসের বইতে পাই, তারা বিশ্বাস করতো, তাদের শাইখ তা-ই এবং তা-ই। আমরা তাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করছি না, আমরা বলছি তারা বলত ও বিশ্বাস করতো, এই পৃথিবীতে বিচরণকারী লোকটি আল্লাহ। এখন আমাকে বলুন, আমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে এই বিশ্বাসকে গ্রহণযোগ্য মনে করে? আমরা সবাই জানি, এরূপ আরও অন্যান্য ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাসও আমাদের উম্মাহর কাছে সর্বসম্মতিক্রমে অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত।

উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি বলে, রাসূল সা.-এর পর জিবরাইল আ. কারও নিকট ওহি নিয়ে এসেছেন কিংবা তাকে অন্য আরেকটি কুরআন দিচ্ছেন– তবে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ ছাড়াই আমরা সকলে এই বিষয়ে একমত যে, এই দলটি কোনো মুসলিম দল নয়। আমাদের ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে এই বিরোধকে আমরা কোনোভাবে সহ্য করতে পারব না। সুতরাং আমার অভিমত হলো, এটা কোনো বিষয় নয় যে, আপনার বিশ্বাস কাঠামো

কোথায় নিহিত। ইসলামে একটি সীমারেখা অঙ্কন করা আছে। আর তাই উপরিউক্ত বক্তব্যের ব্যাপারে আমরা বলি, না, এটা খুবই বাড়াবাড়ি, এটা খুবই অদ্ভুত। ফিলোসোফিক্যালি–

"By definition, every definition has to have boundaries."

"সংজ্ঞাগত দিক থেকে প্রত্যেক সংজ্ঞারই সীমানা থাকতে হবে।"

চিন্তা করুন, যখন আপনি বলেন, আমি একজন মুসলিম। কিন্তু তখন যদি একটি দল এসে বলে, ও তাহলে তুমিও আমাদের মতো বিশ্বাস করো, আমাদের শাইখ পৃথিবীতে বিচরণকারী ইশ্বর। তখন আপনি বলে উঠবেন, না, না, আমি এটা বিশ্বাস করি না। দলটি বলবে আমরাও তো মুসলিম।

বুঝতেই পারছেন, কিছু সীমারেখা থাকা উচিত।

আমি এখন ভূমিকায় আছি, কুরআন মাজিদ শুধু কর্মের সমালোচনা করেনি, সুস্পষ্টভাবে ধর্মতত্ত্বের অনেক দিকেরও সমালোচনা করেছে। কুরআন কর্মের সমালোচনা করেছে, যেমন– তোমাদের সন্তানকে হত্যা করো না, ব্যভিচার করো না, মদ পান করো না ইত্যাদি। আবার কুরআন থিওলজিরও সমালোচনা করেছে, যেমন– তোমরা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করো না। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা অনেক আয়াতে সমালোচনা করেছেন এভাবে– তোমরা কীভাবে বিশ্বাস করো যে ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা? তোমরা কীভাবে বিশ্বাস করো যে মূর্তি তোমাদের উপকার করবে? আমরা জানি, কুরআন এই ধরনের ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা করেছে।

অধিকন্তু, আমরা সকলে জানি, কুরআন মাজিদ এক ধরনের বিশ্বাস প্রচার করেছে, নিশ্চিতভাবে আমরা বিশ্বাস করি– আল্লাহ তায়ালা এক। এমন কোনো মুসলিম আছে কি, যে বলে আল্লাহ তায়ালার সংখ্যা পাঁচ, সাত, দশ ও বিশ? আমরা সকলে একমত, আল্লাহ তায়ালা এক। একত্ববাদী ধর্মগুলোর মূল বিশ্বাস হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। শুধু দার্শনিক দিক থেকে সীমা থাকা আবশ্যক নয়, কুরআন মাজিদের দিক থেকেও সীমা থাকা আবশ্যক। কুরআন মাজিদ ধর্মতত্ত্বের কিছু দিকের সমালোচনা করেছে, আবার কিছু দিককে সমর্থন ও প্রচার করেছে। সেজন্যে যে যত বেশি ধর্মতত্ত্বে মনোনিবেশ করবে, সে তত স্বচ্চভাবে উপলব্ধি করতে পারবে, প্রত্যেকের একটা সীমারেখা থাকা উচিত– এটাই মানুষের প্রকৃতি।

আমার আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো সেই বিখ্যাত হাদিসটি, যেটি উম্মাহর বিভক্তি সংক্রান্ত হাদিস নামে খ্যাত। তেয়াত্তর গোষ্ঠীর হাদিস, তেয়াত্তর দলের হাদিস। এই হাদিসটি রাসূল সা.-এর পনেরোজনের বেশি সাহাবি বর্ণনা করেছেন। যেমন– আনাস বিন মালিক, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা রা. প্রমুখ সাহাবিগণ। আর এটি বর্ণিত হয়েছে প্রায় ডজনখানেক হাদিস গ্রন্থে। যেমন– আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, হাকিম, ইবনে হিব্বান, মুসনাদে আহমাদ– এটি মূলত খুবই সুপরিচিত হাদিস।

এই হাদিসটির কিছু বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, আমার উম্মত অনেক দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। আর অন্য বর্ণনায় উল্লেখ আছে, আমার উম্মত পূর্ববর্তী জাতি ইহুদি, খ্রিষ্টানদের মতো বিভক্ত হয়ে পড়বে। আর অন্য বর্ণনায় এসেছে, উক্ত দলসমূহের মাঝে কেবল একটি দল ছাড়া বাকি সবাই পথভ্রষ্ট হবে। এভাবে আমরা বিভিন্ন বর্ণনা পাচ্ছি।

উম্মতের বিশাল সংখ্যক আলিম, ইসলামের সকল শাখা তথা ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, ফিকহবিদরা হাদিসটিকে সহিহ বলে গ্রহণ করেছেন। এটাই মূলধারার বক্তব্য। আমরা আপনাদের পূর্ণাঙ্গ নামের তালিকা দিতে পারব, যেমন– ইবনে হাজর, নববি, ইবনে কুদামা, যাহাবি, ইবনে তাইমিয়াহ প্রমুখ। মুহাদ্দিস, ফকিহ, আলিমগণ খুবই নিশ্চয়তার সাথে হাদিসটিকে আমাদের মূলধারার ঐতিহ্যের অংশ বলে গ্রহণ করেছেন। ফুটনোট হিসেবে বলে

রাখি, সম্ভবত কয়েকজন আলিম একটি বর্ণনা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তবে তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তবে এই লেকচারের উদ্দেশ্য হলো, মূলধারার মতামতের সাথে সংগতি রেখেই হাদিসটি ব্যাখ্যা করা।

অন্তত যে হাদিস মানে, তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এটি সহিহ হাদিস। এখন আমার মতামত হলো লেকচারটি অগ্রসর হবে এই মতের ভিত্তিতে যে হাদিসটি সহিহ, তবে এটাকে অনেক ক্ষেত্রে ভুলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, ভুলভাবে বোঝা হয়েছে। হাদিসটি সহিহ, আমার নিজের এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, হাদিসটি অনেক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। অনেক বর্ণনা ধারায় বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং হাদিসটি সুস্পষ্টভাবে সহিহ, কিন্তু আমার বিনীত অভিমত হলো, যদি আপনি আমাদের স্কলারদের মত অধ্যয়ন করেন তবে দেখতে পাবেন, এমনকি অনেক প্রথমদিককার স্কলাররা হাদিসটি সম্পর্কে বিভিন্ন ভুল উপলব্ধিকে (মিসআন্ডাস্টান্ডিং) স্পষ্ট করেছেন। তবে সময় সংক্ষিপ্ত হওয়াতে পাঁচটি ভুল উপলব্ধি উল্লেখ করে আমি আমার আলোচনা শেষ করব।

প্রথম ভুল উপলব্ধি

আমাদের মধ্যে কিছু দল ও আলিম মনে করেন, এ হাদিসে আক্ষরিকভাবে ৭৩ বোঝানো হয়েছে। আমরা ৭৩ দলকে গণনা করতে পারব যে, এক নাম্বার দল এটি, দুই নাম্বার দল ওটি, তিন নাম্বার এটি, চার নাম্বার দল ওটি। আর আমরা এভাবে সম্পূর্ণ ৭৩ দলের তালিকা প্রণয়ন করতে পারব। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট সঠিক মত নয়, সঠিক মত হলো ৭৩ একটি জেনেরিক নাম্বার, যা দ্বারা ৭০-এর কাছাকাছি সংখ্যাকে বোঝায়।

আর এর প্রমাণ হলো যে, সব সময় কোনো না কোনো আলিম এক, দুই, তিন- এভাবে সিরিয়াল করে তেয়াত্তরটি দল তালিকাভুক্ত করেছেন, কিন্তু যখন তিনি বইটি লিখা শেষ করলেন, দেখা গেল তখন অন্যান্য দলের উদ্ভব হয়েছে, যাদের তালিকাভুক্ত করা হয়নি। অনেক আলিম এ বিষয়টি আলোকপাত করেছেন, আরবিতে সাত, সত্তর ও সাতশ হলো একটা অভিব্যক্তি (অ্যাক্সপ্রেশন)। আল্লাহ তায়ালা বলেন,
إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ "আপনি যদি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ তাদের (মুনাফিকদের) ক্ষমা করবেন না।"[২]

এর মানে কী? যদি রাসূল সা. তাদের জন্য একাত্তরবার ক্ষমা চাইতেন, তবে কি তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হতো? এটা হলো একটা জেনেরিক নম্বর ৭০। সুতরাং আমরা আক্ষরিকভাবে এক নম্বর এটি, দুই নম্বর ওটি… এভাবে মনে করাটা ভুল। আর এই ধরনের প্রচেষ্টার অর্থবহ কোনো ফলাফল নেই। আমরা এভাবে কোনো হিসেব মেলাতে পারব না; বরং এর অর্থ হলো উম্মাহ সত্তরের কাছাকাছি বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হবে।

দ্বিতীয় ভুল উপলব্ধি

খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রচলিত মত। অবশ্য এটি গড়পড়তা মুসলিমদের মত, কোনো স্কলারের অভিমত নয়। তাদের মত হলো, এর মানে ৭২টি দল কাফির, আর একটি দল মুসলিম।

এটা সুস্পষ্ট ভুল অভিমত। লক্ষ করুন হাদিসের ভাষ্য কী?

"আমার উম্মত তেয়াত্তরটি দলে বিভক্ত হবে।"

তিয়াত্তরটি দলই রাসূল মুহাম্মাদ সা.-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। তারা সবাই মুসলিম। হ্যাঁ, তাদের মধ্যে কিছু ইস্যু আছে, কিছু দ্বিমত আছে; কিন্তু ৭৩টি দলেরই রাসূল সা.-এর প্রতি বিশ্বস্ততা রয়েছে, তাঁর সাথে কিছু সংগতি রয়েছে। রাসূল সা. বলেছেন– "আমার উম্মত", সুতরাং অন্যান্য উম্মাহ নয়। অমুসলিম উম্মাহ নয়,

---

২. সূরা তাওবা : ৮০

এটা আমার উম্মাহ। রাসূল সা. এসব লোকদের নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। আর যখন রাসূল সা. কাউকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেন, তখন কার অধিকার আছে যে সে বলবে, তোমরা তাঁর উম্মত নও। সুতরাং ৭৩টি দলের সবাই মুসলিম।

এর মানে হলো আমরা এই ৭৩টি দলে তাদের অন্তর্ভুক্ত করব না, যারা বলে আল্লাহ তায়ালা মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে আগমন করেছেন। এরা এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। আমরা এই ৭৩টি দলের তালিকায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করব না, যারা বলে মুহাম্মাদ সা.-এর পরে আরও নবি আসবেন। তাদের এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এই তালিকা হলো তাদের, যাদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছ; কেউ অধিক নিকটবর্তী, কেউ দূরবর্তী– তবে তারা একটি সাধারণ মুসলিম কাঠামোর মধ্যে রয়েছে। আর যদি তারা মুসলিম হয়, তবে এর অর্থ কী? ...

এর মানে হলো, প্রত্যেক দল উম্মাহর ভ্রাতৃত্বের হকদার। "মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই।" তাদের সবাই উম্মাহর স্বাভাবিক কল্যাণকামিতার হকদার। তাদের সবাই হকদার সালামের উত্তর পাওয়ার, অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়ার, জানাযায় অংশগ্রহণ করার। রাসূল সা. বলেছেন, "এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের হক হলো; তাকে বিপদে সাহায্য করা হবে, তাকে অপমানিত করা হবে না, অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে, সালামের উত্তর দেবে..." ইত্যাদি। তেয়াত্তরটি গ্রুপই ইসলামের উম্মাহ ও ইসলামের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। কারণ রাসূল সা. বলেছেন, "আমার উম্মাহ"।

এটাই দ্বিতীয় মিসআন্ডাস্ট্যান্ডিং। এই পার্থক্যটা ইসলাম ও কুফরের মধ্যে নয়, এই পার্থক্যের সীমারেখা ইসলামের ফ্রেমওয়ার্কের (কাঠামোর) মধ্যেই।

তৃতীয় ভুল উপলব্ধি

রাসূলুল্লাহ সা. এক বর্ণনায় বলেছেন, "৭২টি দল পথভ্রষ্ট আর বাকি একটি দল সঠিক।" সুতরাং এই তালিকার ক্ষেত্রে আরেকটি ভুল উপলব্ধি হলো অধিকাংশ উম্মাহ পথভ্রষ্ট। সর্বোপরি ৭৩টি দলের মধ্যে ৭২টি পথভ্রষ্ট। এটা অনুপাতে খুবই বেশি। এভাবে গড়পড়তা সাধারণ মানুষ মনে করে বিশাল সমাবেশের মধ্যে কেবল স্টেজে বসে থাকা দু-তিনজন সুপথপ্রাপ্ত। অর্থাৎ, ক্ষুদ্র একটি গ্রুপ সুপথপ্রাপ্ত, আর অন্য সবাই বিপদগামী। কারণ, সর্বোপরি ৭৩ এর মধ্যে ৭২! বিশাল অনুপাত। এটা একটা বড়ো রকমের ভুল বোঝাবুঝি, কারণ কুরআন-হাদিসে আল্লাহ তায়ালার অসীম দয়া বিঘোষিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমার উম্মাহ হবে সবচেয়ে বড়ো উম্মাহ, আর কোনো উম্মাহ এর কাছাকাছি পৌঁছবে না, এর সাথে তুলনীয় হবে না। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী হবে আমার উম্মাহ থেকে।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, "আমার উম্মাহ হলো এমন উম্মাহ, যার ওপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ রয়েছে।" এ বিষয়ে অসংখ্য হাদিস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর উম্মাহর অধিকাংশ মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে, রাসূল সা.-এর শাফায়াত সকল মুসলিমের জন্য। সুতরাং সুপথপ্রাপ্ত দল উম্মাহর একেবারে ছোটো অংশ, এক পার্সেন্টের মতো– এ উপলব্ধি ভুল। তবে আমরা যারা এই হাদিসটি সঠিক বলে মনে করি, তারা কীভাবে এই হাদিসের সাথে সমন্বয় করব? যেহেতু হাদিসে বলা হয়েছে ৭২টি দল জান্নাতে যাবে না। খুবই সহজ। ৭২টি দলের সবগুলো দলই খুবই ক্ষুদ্র, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। আমি আপনাদের একটি দলের ক্লাসিক (চিরায়ত) উদাহরণ দিচ্ছি– তারা বহু পূর্বে গত হয়ে গেছে, কিন্তু যেকোনো ধর্মতত্ত্বের ছাত্র এই গ্রুপটি সম্পর্কে জানে।

মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার মাস্টার্সের ৮৫০ পৃষ্ঠার আরবি গবেষণা প্রবন্ধ ছিল এ গ্রুপ ও তার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে। এই দলটির নাম হলো জাহমিয়া। বর্তমানে এদের অস্তিত্ব নেই, কিন্তু ধর্মতত্ত্বের প্রতিটি বইতে এই বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। আমি এ দল সম্পর্কে মাস্টার্স করেছি। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, সম্ভবত এ দলটিতে সর্বোচ্চ লোকবল ছিল ৫০-১০০জন। সুবহানাল্লাহ। আমাদের আলিমগণ এই বিষয়ে অনেক কাজ করেছেন, কারণ জাহমিয়াদের বিশ্বাস ছিল সত্যিই অদ্ভুত। তাই তারা সব সময় জাহমিয়া দলটিকে খণ্ডন করতে

কথা বলেছেন। জাহমিয়াদের ভুল বোঝাপড়াকে সংশোধন করতে চেষ্টা করেছেন। সকলে তাদের সম্পর্কে কথা বলেছেন।

এমনকি ইমাম বুখারি সহিহ বুখারির শেষ অধ্যায় বিন্যাস করেছেন 'তাওহিদ ও জাহমিয়াদের খণ্ডনের অধ্যায়" শিরোনামে। সুতরাং কেউ যদি এই দলটি সম্পর্কে খুব বেশি না জানে, তবে সে মনে করবে এই দলটি বুঝি উম্মাহর ৫০ শতাংশ। কিন্তু আপনি যখন ইতিহাস পড়বেন, তখন দেখতে পাবেন, তারা ছিল সরব ও ভোকাল একটিভিস্টদের একটি ক্ষুদ্র দল। তারা ছিল সরব ও ভোকাল, কিন্তু বাস্তবে তারা ছিল সংখ্যায় নগণ্য। সুতরাং ৭০ কিংবা ৭২ দল এরা সবাই হলো ছোটো ছোটো পকেটের মতো। কিন্তু উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সঠিক পথে আছে। আলহামদুলিল্লাহ। এটাই বাস্তবতা।

সাধারণ মুসলিমরা ইমানের ৬টি স্তম্ভের ওপর বিশ্বাস করে, ইসলামের ৫টি রুকনে বিশ্বাস করে এবং ইবাদত পালনের চেষ্টা করে। এটাই ইসলাম। প্রত্যেক মুসলিম উচ্চতর ও দুর্বোধ্য ধর্মতত্ত্ব পড়তে বাধ্য নয়। তাই এটা হলো তৃতীয় ভুল বোঝাপড়া। অধিকাংশ উম্মাহর ওপর আল্লাহ তায়ালার দয়া থাকবে। এমনকি ৭২টি দল পথভ্রষ্ট হলেও, তারা সবাই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দল মাত্র। অধিকাংশ উম্মতের ওপর আল্লাহর রহমত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "আমার উম্মাহ এমন উম্মাহ, যার ওপর আল্লাহ তায়ালার রহমত রয়েছে।"

চতুর্থ ভুল উপলব্ধি

এই হাদিসটির মধ্যে সবচেয়ে সংশয়পূর্ণ একটি বাক্য, যা অনেক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। তা হলো "৭২টি দলই জাহান্নামে যাবে এবং কেবল একটি দল জান্নাতে যাবে।" কিন্তু আলিমদের অভিমত হলো, যেমন বিখ্যাত আলিম ইমাম শাওকানি বলেন, "এই বাক্যটি সঠিক নয়"। তিনি বলেন, "হাদিসটি সঠিক, কিন্তু বাক্যটি ভুল।" অন্যান্য আলিমরা দ্বিমত করে বলছেন, না, বাক্যটিও সঠিক। এমনকি বাক্যটি যদি সঠিকও হয়, তবু এতে ধর্মতাত্ত্বিক কোনো সমস্যা নেই। কেন এবং কীভাবে? কারণ আমাদের ধর্মতত্ত্বের, কুরআন ও সুন্নাহর উপলব্ধি অনুসারে, আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তায়ালা যদি কোনো ব্যক্তিকে পুরস্কার প্রদানের ওয়াদা করে শর্ত দেন, যে এই আমল করবে, সে এই পুরস্কার পাবে। যেমন, "যে ব্যক্তি দিনে ১২ রাকাত সুন্নাত সালাত আদায় করবে, আমি তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবো।"– এটা হাদিস। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়ে ওয়াদা করছেন তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন এবং তার হকদারকে দয়া ও পুরস্কারে ভূষিত করবেন। যাহোক, আমরা এও বিশ্বাস করি, আল্লাহ তায়ালা শাস্তির যেসব হুমকি দিয়েছেন, সেটা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাধীন; তিনি চাইলে শাস্তি দিতে পারেন আবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন। পুরস্কার আর শাস্তির প্রদানের প্রকৃতি এক নয়। আল্লাহ তায়ালা যদি কারও অপরাধ ক্ষমা করে দেন, এটা তার মাহাত্ম্য। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কারও পুরস্কার বাতিল করবেন না।

আল্লাহ তায়ালার উদাহরণই যথার্থ উদাহরণ (Allah belongs the perfect exmple)। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যে মদ পান করে তার ওপর আল্লাহর লানত। এর মানে এই নয়, প্রত্যেক মদপানকারীকেই আল্লাহ ধ্বংস করে দেবেন। আল্লাহ তায়ালা কাউকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন আবার শাস্তিও দিতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা কারও অপরাধকে উপেক্ষা করতে পারেন এবং ব্যক্তির ভালো কাজকে বিবেচনায় নিতে পারেন। একজন এলকোহল পান করেছে বলে তার সকল আশা শেষ হয়ে যায়নি। সুতরাং আল্লাহর শাস্তি ও হুমকি বাস্তবায়ন করা তার জন্য আবশ্যক নয়; বরং তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন এবং তিনি ভালো কাজকে বিবেচনায় নিতে পারেন। সেজন্য আলিমরা বলেছেন, হাদিসে যে বলা হয়েছে ৭২ দল জাহান্নামে যাবে, এমনকি এ অংশটি যদি সঠিকও হয় তারপরও আল্লাহ তায়ালা তো সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে বিচার করবেন। এর মানে হলো ৭২টি দলের সবাইকে আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তিগতভাবে বিচার করবেন; ভালো কাজের ও মন্দ কাজের হিসাব অনুসারে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া, (আমার পিএইচডি ছিল ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ওপর) যারা তাকে চিনেন তারা জানেন, তিনি খুবই অকপট ও জোরালো ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার *মাজমুয়ায়ে ফাতওয়া* গ্রন্থে বলেন,

"কেবল কেউ সঠিক দলের সাথে সম্পৃক্ত হলেই তিনি জান্নাতে চলে যাবেন কিংবা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে আরাহণ করবেন– বিষয়টি এমন নয়। নিশ্চিতভাবেই কেউ কোনো একটি ভ্রান্ত দলের সাথে সম্পৃক্ত হয়েও ব্যক্তির ইখলাস ও নেক আমলের কারণে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। কেউ মনে করতে পারে, সে সঠিক দলের সাথে ও সঠিক ধর্মতত্ত্বের সাথে আছে, কিন্তু হতে পারে তার পাপের কারণে, তার হৃদয়ে অহংকারের কারণে তিনি জান্নাতে যাবেন না অথবা জান্নাতের নিম্নস্তরে অবস্থান করবেন।"

এটা খুবই মৌলিক নীতিমালা। এটা আমাদের বোঝা ও ধারণ করা প্রয়োজন। কেবল একটি দলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণেই আপনি জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হবেন না, এর জন্য প্রয়োজন ইখলাস ও সৎকর্ম। আর একজন ব্যক্তি যদি অন্য একটি দলের সাথে সম্পৃক্ত হয়, কিন্তু তার হৃদয়ে রয়েছে তাকওয়া এবং সম্পাদন করে চলেছেন আমলে সালিহ। তখন এটা সম্ভব যে, এই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার চোখে এই তাকওয়া ও নেক আমলের কারণে সেই ব্যক্তি থেকে অত্যধিক প্রিয় হিসেবে পরিগণিত হতে পারেন, যে সহিহ দলের সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু তার তাকওয়া নেই, নেক আমল করেনি।

পঞ্চম ভুল উপলব্ধি

আমাদের খুবই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, প্রত্যেকটি মতামতের বিষয়ে খুবই সতর্কতা প্রয়োজন। প্রতিটি মতপার্থক্য তথা ছোটোখাটো মতপার্থক্য আলাদা দল বা উপদল বানিয়ে ফেলে না। সাধারণভাবে বলতে গেলে উম্মাহ একটি স্বাস্থ্যকর বৈচিত্র্যতা সহ্য করে। কেবল বড়ো ইস্যুতে মতানৈক্য হলে তবেই তা একটি ভিন্ন দলে পরিণত হয়। যেমন, একদল তাকদির কে বিশ্বাস করে, অন্যদল তাকদিরে বিশ্বাস করে না। হ্যাঁ, এটা দুটি দলের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশকারী পয়েন্ট। অনেক মুসলিম একটি তুচ্ছ বিষয়কে ধর্মতত্ত্বের মৌলিক ইস্যু বানিয়ে ফেলে। একজন কীভাবে নামাজ পড়ে তথা আমিন উচ্চঃস্বরে বলে, নাকি নীরবে পড়ে? তারাবির নামাজ ৮ রাকাত নাকি ২০ রাকাত? এসব ছোটোখাটো বিষয়ে মতপার্থক্য ভিন্ন দলে পরিণত করে না। আমাদের জানা প্রয়োজন কোন পার্থক্যগুলো আসলেই বড়ো আর কোন মতপার্থক্যসমূহ ক্ষুদ্র। আর ধর্মতত্ত্বের স্কলাররা ঠিক এটাই করেন। তাহলে এর উপসংহার কী?

উম্মাহর বিশাল অংশ দলাদলিতে জড়িত নয়

এর উপসংহার হলো উম্মাহর বিশাল একটা অংশ এসব দলাদলিতে জড়িত নয়, তারা এসবে মাথাও ঘামায় না– এই সত্য অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। এটা ভালো একটি দিক। সাধারণ সব মুসলিমদের থিওলজির (ধর্মতত্ত্বের) উচ্চতর বিষয়গুলো পড়ার প্রয়োজন নেই, তাকদির কীভাবে কাজ করে ইত্যাদি বিষয়ে তাদের বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। একজন ব্যক্তি যখন ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ ও ঈমানের ৬টি স্তম্ভে বিশ্বাস করে, প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের চেষ্টা করে এবং বড়ো বড়ো গুনাহগুলো এড়িয়ে চলে সে একজন মুসলিম। সাধারণ মুসলিমদের সাথে বিভিন্ন গ্রুপের লেবেল জুড়ে দেওয়া অর্থহীন। তাদের বিভিন্ন দলের সাথে সম্পৃক্ত করা অর্থহীন। কারণ এই লেবেলটা হয়তো তার বাবা দিয়েছে, তার মা দিয়েছে, কিন্তু সে জানেই না এর অর্থ কী? ওমুক দল, তমুক দল দ্বারা কী বোঝানো হয় এই বিষয়ে হয়তো তার কোনো ধারণাই নেই। তবে যারা ইসলামের বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে (ফিকাহ, উসূলে ফিকাহ) পারদর্শী, যারা ইসলাম নিয়ে বিশেষ পড়াশোনা করেছে এবং যারা মসজিদের ইমাম– নিঃসন্দেহে তাদের কোনো না কোনো ধর্মতাত্ত্বিক অবস্থান গ্রহণ করতে হয়।

সমন্বয়

একটি খোলামেলা ও বিতর্কিত উদাহরণ দিচ্ছি– রাসূল সা.-এর সাহাবাদের সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে দুটি অভিমত রয়েছে। একদল (আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত) মনে করেন, সাহাবিরা সকলে ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তারা মনে করেন, সাহাবায়ে কেরাম রা. রাসূল সা.-এর পর সর্বোত্তম প্রজন্ম। তারা সাহাবায়ে কেরাম রা.-কে ভালোবাসেন এবং এই ভালোবাসাটাকে ঈমানের অংশ মনে করেন। অন্য দলটি (শিয়ারা) এই মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তারা বলে সাহাবারা রাসূল সা.-কে অমান্য করছিল, অথবা তারা এটা করছিল, ওটা করছিল। এমনকি তারা এটা বিশ্বাস করাকে তাদের ধর্মের অংশ মনে করে যে সাহাবাদের অনেকে বিপদগামী হয়েছিলেন, তারা রাসূল সা.-এর আনুগত্য করেননি। সুতরাং এই বিষয়ে সমাধান কী?

প্রথমত

আমাদের যা করা দরকার তা হলো, এখানে এই দুটি দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান, এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। দুটি দলের জন্যই এটা খুবই আবেগাত্মক ইস্যু। আমাকে এমন একটি খোলামেলা ইস্যুতে পাবলিক প্লাটফর্মে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ICNA-কে ধন্যবাদ জানাই। যাহোক, আমাদের প্রথম করণীয় হলো, যেহেতু এর অস্তিত্ব অস্বীকার কিংবা অগ্রাহ্য করার কোনো সুযোগ নেই, তাই এ বিষয়ে কথা বলা দরকার।

দ্বিতীয়ত

আমরা যে ধর্মতত্ত্বের অনুসারী হই না কেন এই বিষয়ে আমার সকলে একমত হতে পারি– ইসলাম, কুরআন ও রাসূল সা. কখনও বিরুদ্ধ মত কিংবা ভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক মতের ওপর শারীরিক সহিংসতার অনুমোদন দেননি। অকপটে বলছি, আমি একজন সুন্নি এবং একজন সুন্নি হিসেবে আমি গর্বিত। আমি একজন ধর্মতাত্ত্বিক এবং আমার বিশেষত্ব ইসলামি ধর্মবিদ্যায় (থিওলজিতে)। আমি থিওলজি পড়াই ও প্রচার করি। আমি সুন্নি থিওলজিতে বিশ্বাস করি। আমি শিয়া মতবাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করি। কিন্তু নিছক শিয়া হওয়ার কারণে কোনো শিয়ার ওপর শারীরিক আক্রমণকে সমর্থন করতে পারি না। আমি আমার থিওলজির প্রতি যতই আবেগী হই না কেন, যারা অন্যের ওপর থিওলজি জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়, যারা লাঠি, তরবারি ও বোমা দিয়ে থিওলজি প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে আমি বাধ্য। আপনি যা বিশ্বাস করতে চান বিশ্বাস করুন। আপনি যুক্তিতর্ক করতে চান, যুক্তিতর্ক করুন। কিন্তু সেইসাথে অন্যের বিশ্বাসের স্বাধীনতাকেও স্বীকার করুন।

তৃতীয়ত

প্রচারক, কর্মকর্তা, আলিম, স্কলার ও আয়াতুল্লাহদের স্থান, সময়, শ্রোতা, ভাষা ও পদ্ধতির প্রেক্ষাপট বোঝা দরকার। স্কলারদের বোঝা দরকার তারা হয়তো সরাসরি অস্ত্র হাতে কাউকে আক্রমণ করেন না, কিন্তু তাদের আবেগাত্মক, হিংসাত্মক, জ্বালাময়ী ভাষণ তাদের অনুসারীদের হত্যায় উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং স্কলার ও আলিমদের এটা বোঝা দরকার, তাদের দায়িত্ব কেবল সত্য প্রচার নয়, তাদের দায়িত্ব এর থেকেও থেকে বেশি কিছু। সত্য প্রচার করতে হবে প্রজ্ঞার সাথে।

আমি একটি খুবই বোধগম্য উদাহরণ দিচ্ছি– আমি নিজে আমার ভুল থেকে শিখেছি। দুই দশক আগে আমিও বহু জ্বালাময়ী ভাষণ ও বক্তব্য দিয়েছি। আমি এমন কিছু কথা বলেছিলাম, যা আজও আমার ক্ষতি করে চলেছে। সেটা ছিল আমার তারুণ্যদীপ্ত কথামালা। আমি হয়তো নিজেকে এই বলে সান্তনা দিতে পারি– এ ছিল ২১ বছর বয়সী এক তরুণের ভাষণ। কিন্তু এটা এ সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না যে আমি ভুল করেছিলাম; উত্তেজনাকর বক্তব্য রেখেছিলাম, আমি এর জন্য আজও অনুতপ্ত। আমি যদি পারতাম, তবে আমার সেসব জ্বালাময়ী কথাগুলো ফিরিয়ে নিতাম। আমাদের সকল আলিমদের বোঝা দরকার– আপনি যা

চান তা প্রচার করতে পারেন। কিন্তু হিংসা প্রচার করবেন না, সহিংসতা প্রচার করবেন না। এমন কোনো কিছু প্রচার করবেন না, যা আপনার অনুসারীদের যেকোনো প্রকারের শারীরিক সহিংসতায় প্ররোচিত করতে পারে।

চতুর্থত

যারা থিওলজিকে মনেপ্রাণে চর্চা করেন, আমিও তাদের একজন। আমাদের বোঝা প্রয়োজন, যেকোনো উৎস ও ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যক্তি ও সমাজকে কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা করাকে ইসলাম কেবল অনুমোদন করেনি, বরং এর নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা পরস্পর কল্যাণকর ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর, আর মন্দ ও অবাধ্যতার কাজে সহযোগিতা করো না।"

এটা কোনো বিষয় না– আপনি কতবেশি রক্ষণশীল; আপনার ধর্মতত্ত্ব কতবেশি কঠোর; আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কী। সুতরাং আমাদের সবার একটা জিনিস প্রয়োজন– সহযোগিতার বৃত্ত তৈরি করা। কিছু ক্ষেত্রে, কিছু বিষয়ে আমাদের অবশ্যই একে অপরকে সহযোগিতা করতে হবে। আমরা কাউকে একটি ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা মানে এই না যে, আমরা তাদের সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছি। আমাদের যথেষ্ট বড়ো মন-মানসিকতার অধিকারী হওয়া উচিত, অন্যকে সহ্য করা উচিত। যেমন, আমি আমার বাবার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। তিনি ১৯৬৩ সালে হাস্টন টেক্সাসে এসেছিলেন। তিনি আমাদের বলেন, ষাটের শুরুতে এবং সত্তরের শেষের দিকে কেউ নিজেদের শিয়া, সুন্নি, সুফি ও বেরলবি নামে পরিচয় দিতেন না, এবং তারা সবাই মিলে হাস্টনে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। কেন? কারণ সে সময় এখানে স্বল্পসংখ্যক মুসলিম ছিলেন। তারাও যদি দুইজন এক দলে আর দুইজন অন্য দলে বিভক্ত হয়ে পড়তেন, তবে তখন কোনো মসজিদ নির্মিত হতো না। আমাদের সকলের পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। সে সময় তারা এটা বোঝার মতো যথেষ্ট প্রজ্ঞাবান ছিলেন।

সত্তরের দশকে এবং আশির দশকের শুরুতে যখন সুন্নি ও শিয়া কমিউনিটিতে অনেক মুসলমান আসা শুরু করল, তখন তারা তাদের মতো আলাদা হয়ে বসবাস করতে শুরু করল এবং তাতে দুটি কমিউনিটির মধ্যে সম্প্রীতি বজায় ছিল। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এমন– ঠিক আছে তুমি তোমার মতো থাকো, আমি আমার মতো থাকি। সে সময় এরূপ পৃথকীকরণ যথার্থ ছিল।

কিন্তু যখন কমন সংকট তৈরি হয়, তখন আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। একই সারিতে দাঁড়াতে হবে। কেবল একটি ইস্যুতে মতপার্থক্যের কারণে কতেক আলাদা মসজিদ তৈরি করে। আলহামদুলিল্লাহ, তাদের পৃথক মসজিদ তৈরি করতে দিন। এতে কোনো সমস্যা নেই। যারা এই মসজিদে এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে চায়, আর আরেক মসজিদে অন্য ওয়াক্ত আদায় করতে চায় আদায় করতে পারে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যারা পৃথক মসজিদ তৈরি করতে চায় এই উদ্দেশ্যে– তারা অন্য মসজিদে নামাজ পড়বে না, তবে তাদের যথেষ্ট বড়ো মনের অধিকারী হতে হবে। বুঝতে হবে আজ আমাদের হাতে হাত মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। আজ সকল ভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করা দরকার। আমরা যখন এসব মতপার্থক্যকে এড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ হব, এর মানে এই নয়– আমরা এই মতপার্থক্যগুলোকে অতি তুচ্ছ মনে করেছি। বরং এর মানে হলো, আমরা গাছ থেকে বন দেখার মতো যথেষ্ট জ্ঞানী, আমরা মন থেকে বড়ো চিত্র দেখতে সক্ষম।

অনুপম দৃষ্টান্ত

সমাপ্তিতে আমি একটি যথার্থ উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছি। এটি এমন একজন ব্যক্তির, যাকে সুন্নি ও শিয়া উভয় সম্প্রদায় বিশেষ শ্রদ্ধা করেন। তিনি হলেন সাইয়িদুনা আলী ইবনে আবু তালিব রা.। আল্লাহর কসম! তাঁর জীবনের একটি ঘটনা আমাদের জন্য বিশেষ দিক-নির্দেশনা দানকারী। আমি ইসলামি খিলাফতের একটি অসাধারণ ঘটনা বর্ণনা করছি।

একটি দল উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তারা হলো খারেজি। তাদের অদ্ভুত কিছু বিশ্বাস ছিল। পরিস্থিতি এমন হয়ে পড়েছিল– যদি আলী রা. অঙ্গুলি নির্দেশ করতেন, তবে খারেজিদের সবাইকে তাঁর নির্দেশে হত্যা করা হতো। কিন্তু আলী রা. কী করেছিলেন? তিনি এটা বলেননি, তোমরা যা চাও তা-ই করতে পারো। তিনি একজন মুসলিম, তিনি তাঁর বিশ্বাসকে ভালোবাসতেন। তিনি কী করেছিলেন? তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ধর্মতত্ত্ববিদ, প্রচারক ও স্কলার আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে সংলাপের জন্য, বিতর্কের জন্য এবং তাদের নিকট সত্য তুলে ধরার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

তাদের এটা বোঝানোর জন্য ইবনে আব্বাস রা.-কে প্রেরণ করা হয়েছে যে, তাদের বিশ্বাস সঠিক নয়। ইবনে আব্বাস রা. খারেজিদের নিকট উপস্থিত হলেন, তিনি পাবলিক ডিবেটের আয়োজন করলেন। ফলে তাদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ আলী রা.-এর দলে ফিরে এলেন। দুই-তৃতীয়াংশ রয়ে গেল।

মুসলিম ভাই-বোন! শুনুন, আলী ইবনে আবু তালিব রা. এই দুই-তৃতীয়াংশ সম্পর্কে কী বললেন? তিনি তাদের কাছে একজন বার্তাবাহককে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যদি তোমরা তোমাদের ধর্মতত্ত্বে অটল থাকার সিদ্ধান্ত নাও, তবে আমাদের কোনো অধিকার নেই যে, তোমাদের ওপর জোরজবরদস্তি করব। এটা তোমাদের বিষয়, আমরা কেবল তোমাদের সত্য পথটি দেখাবার চেষ্টা করেছি। আমরা তোমাদের থিওলজির সাথে একমত নই। কিন্তু তোমরা যদি এতে অনড় থাকতে মনস্থ করো; তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাদের ক্ষতি করবে না, আমরাও তোমাদের ক্ষতি করবো না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুসলিমদের ক্ষতি না করছো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরাও তোমাদের ক্ষতি করছি না; কিংবা কাউকে তোমাদের ক্ষতি করতে দিব না। আলী ইবনে আবী তালিবের এই ফিলোসোফি আমাদের ধারণ করা প্রয়োজন।

যবনিকা

হ্যাঁ, আমি অনেক থিওলজির সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারি, কিন্তু অন্যের ওপর আমার থিওলজি চাপিয়ে দেওয়ার কোনো অধিকার আমার নেই। প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এসব মতপার্থক্য উম্মাহর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে এক হাজার, বারোশত, চোদ্দোশত বছর ধরে। আপনি কী মনে করেন, আমাদের সম্মিলিত ঘৃণার চাষ এই মতপার্থক্য দূর করতে পারবে? না, এটা থাকবেই। বাস্তবধর্মী হোন, বাস্তবতায় নেমে আসুন। এই দল-উপদল অবশিষ্ট থাকবেই, আমরা চাই বা না চাই। সুতরাং আমাদের সাধারণ ঐকমত্যের জায়গায় কিছু করুন। এই পৃথিবীকে উত্তম বাসস্থান পরিণত করার জন্য চলুন কিছু করি। বিচারের ভার আল্লাহ তায়ালার ওপর ছেড়ে দিন। দুনিয়ায় আমরা সবাই এ বিষয়ে একমত হতে পারি– আমরা একে অপরের ক্ষতি করব না, একে অপরের প্রতি সহিংস হব না। বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণে শারীরিক আক্রমণ করা কোনো মুসলিমের দায়িত্ব-কর্তব্য নয়। পরিশেষে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে হিংসার বিষবাষ্প চড়ানোর মতো জঘন্য পাপ থেকে রক্ষা করুন।

ড. তারিক রামাদানের বক্তব্য

প্রিয় ভাই ইয়াসির ক্বাদির হাদিসটির ওপর ৩০ মিনিটে যে আলোচনা করেছেন, তা বাস্তবে কঠিন কাজ হলেও তিনি চমৎকার আলোচনা করেছেন। কীভাবে বৈচিত্রতা (ডাইভার্সিটি) ও মতবিরোধের সমাধান করতে হবে? আজকাল আমরা যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি তার সমাধান হলো, আমাদের কুরআন-হাদিসের দিকে ফিরে যেতে হবে। বর্তমান মুসলিমদের মধ্যে বিদ্যমান বাস্তবতাকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বুঝতে হবে। গভীরতর উপলব্ধির জন্য মাঝে মাঝে টেক্সটের কাছে ফিরে যেতে হবে। আমি এই বিষয়ে অনেক বই লিখেছি,

সম্মেলেনের পর সম্মেলনে আলোচনা করেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো, আপনারা যথেষ্ট পড়েন না। আমি মনে করি, এখানে এক ঘণ্টা বসে লেকচার শোনা আর বই নিয়ে পড়তে বসার মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যখন আপনি একটি বই নিয়ে পড়তে বসবেন এবং মূল বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করবেন, তা এক ঘণ্টা বসে লেকচার শোনার থেকে গভীরতর। কারণ, আপনি এখন কিছু চিন্তা শুনছেন এবং এর সাথে মিশে যাচ্ছে অসংখ্য আবেগ।

বক্তব্যের সময় কেন আমি হাততালি পছন্দ করি না

আপনারা জানেন, এ কারণে আমি বক্তব্য শোনার সময় মানুষের হাততালি দেওয়াকে পছন্দ করি না। আপনি বই পড়ার সময় গভীরতর চিন্তার কিছু পেলে তো হাততালি দেন না, তাহলে বক্তব্যের সময় কেন হাততালি দেন! আর যদি আপনি বই পড়ার সময়ও হাততালি দেন, তবে সম্ভবত আপনার কোনো সমস্যা আছে। সুতরাং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আপনি বই পড়ার সময় কেন হাততালি দেন না। কারণ, বইটি আপনার মনের সাথে কথা বলছে। আপনি যখন কোনো কিছু পড়ে খুবই অভিভূত হয়ে পড়েন, তখন সেটা পড়া বন্ধ করে দেন এবং চিন্তা করতে শুরু করেন আর বলেন, বাহ! এটা গভীরতর। এই নীরবতা হলো অসাধারণ এক মুহূর্ত।

আধ্যাত্মিক ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অভিযাত্রা

আপনি যদি বৈচিত্র্য নিয়ে কাজ করতে চান, তবে আপনাকে ইমোশনাল হয়ে পড়লে চলবে না। এটা হলো, এক সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অভিযাত্রা। ইয়াসির ক্বাদি ঠিক যে কথাটি বলেছেন তা হলো, নিজের জ্ঞান সম্পর্কে সতর্ক হোন, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করুন, আপনার আশেপাশের লোকজনের দিকে তাকান এবং তাদের ওপর আপনার মতামত জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন। কারণ, আপনি মনে করছেন আপনি সঠিক, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল হয়তো আপনি ভুল। আপনি মনে করছেন তারা ভুল, কিন্তু হতে পারে তারা সঠিক; বরং আপনিই ভুল।

আমাদের এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। আর এই কাজটিই আমি কয়েক বছর ধরে করে যাচ্ছি। আমি জানি না কতটি লেকচার দিয়েছি, তবে ৩৩টি বই লিখেছি। জানি না মুসলিমরা তার মধ্যে কতটি পড়েছে। আমি আপনাদের যে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করছি তা হলো, সময় নিয়ে বই পড়ুন এবং নিজের দায়িত্বটি সম্পন্ন করুন। আমাদের বৈচিত্র্যতা নিয়ে কাজ করতে হবে। আর লক্ষ্য করুন আল্লাহ তায়ালা বিশ্ব সম্পর্কে কী বলছেন। তিনি আমাদের বলছেন, মানবতা একক– قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاس 'বলুন, হে মানব সকল...'।

অর্থাৎ, তিনি একক মানবতার সাথে কথা বলছেন। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আমরা সবাই আদম আ. থেকে এসেছি। আমরা সবাই এক পরিবারভুক্ত। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا "আমরা তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পর পরিচয় দিতে পারো।" তিনি আরও বলেন, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً "আল্লাহ তায়ালা চাইলে তোমাদেরকে একটি জাতিই বানাতে পারতেন।"[3] তিনিই মানবতার জন্য বৈচিত্র্য চেয়েছেন। তিনি কেবল একটিমাত্র জাতি বানাতে চাননি; বরং তিনি মানবতার মধ্যে একটি বৈচিত্র্যতাও চেয়েছেন।

বৈচিত্র্য হলো একটি চ্যালেঞ্জ ও নেসেসিটি

আমরা যত বেশি বুঝতে পারব, এই বিচিত্রতা আমাদের নিজ সম্পর্কে ও অন্যদের সম্পর্কে জানতে সহায়তা করছে, আমরা ততো বেশি সমৃদ্ধ হব। বৈচিত্রতা হলো একটি চ্যালেঞ্জ ও নেসেসিটি। মানবতায় শক্তি ও

---

৩. সূরা নাহল : ৯৩

সত্যের সাথে কোনো এককতা নেই। আল্লাহ তায়ালার নিকট ও আমাদের জন্য একমাত্র সত্য হলো বৈচিত্রতা। আমাদের আদান-প্রদান করতে হবে, শিখতে হবে ও শুনতে হবে। এটা সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

এমনকি যারা বলে আমি আল্লাহতে বিশ্বাস করি না, তাদেরকেও মানুষ হিসেবে সম্মান করুন, যদিও তারা যা বলছে তার সাথে আপনি একমত নন। লা ইকরাহা ফিদ দ্বীন-এর অর্থ এটাই। লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন-এর অর্থও এটাই। সুতরাং এখন এ ফ্রেমওয়ার্কের মধ্য দিয়ে চিন্তা করুন, ইসলামও তা-ই বলছে। আমাদের মধ্যে কেন বৈচিত্র্য রয়েছে? কারণ, আল্লাহ তায়ালা আমাদের একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমাদের পথচলার জন্য ও বৈচিত্রতার সমাধানের জন্য দিয়েছেন কুরআন-হাদিস।

বৈচিত্র্যের শুভ্র মিছিল

আর যে মুহূর্তে আপনি টেক্সট নিয়ে কথা বলছেন, কুরআনুল কারিমের আয়াত নিয়ে কথা বলছেন, এর অর্থ হলো আপনি ঠিক সে মুহূর্তেই আয়াতের অনেক ব্যাখ্যার সম্মুখীন হয়েছেন। Texts mean talking to our minds and minds mean diversity. (টেক্সটের অর্থ তা আমাদের মনের সাথে কথা বলছে, আর মন মানে তো বৈচিত্রতা।) একই টেক্সট ঠিক একই অর্থে আমরা সবাই উপলব্ধি করতে পারি না। জানেন, মাঝে মাঝে কীসে ঝামেলা সৃষ্টি করে? সেটা হলো একই টেক্সট আপনার সাথে একই ভাষায় কথা বলে না। যখন আপনি টেক্সট পড়েন, তখন আপনার ভেতর একটা বৈচিত্রতা কাজ করে, এর ফলে অর্থের ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। (The same texts are not talking to you the same way, depending when you read them. You have an inner diversity.)

মাঝে মাঝে আপনাকে লিটারালিস্ট (অক্ষরবাদী) হতে হবে, যা লেখা আছে তাই আমলে নিতে হবে– এতে শব্দ নিয়ে খেলার চেষ্টা করা যাবে না। আবার মাঝে মাঝে আপনাকে নিগূঢ় অর্থের অনুসন্ধান করতে হবে। এটাই আমাদের অভিযাত্রা, আমাদের ভেতর রয়েছে বৈচিত্রের শুভ্র মিছিল। কখনও মন প্রবল হয়ে ওঠে, কখনও বা হৃদয়, আবার কখনও বা প্রবল হয়ে উঠে আবেগ, এটাই মানবতা। আমাদের এটা এভাবেই দেখতে হবে, যখন আপনি টেক্সট নিয়ে কাজ করবেন, তখন আপনাকে বুঝতে হবে এর রয়েছে অসংখ্য উপলব্ধি, রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা। আমি যখন মিশরে শাইখের নিকট পড়ছিলাম, আমি যে সাতটি বিষয়ে ইজাযত পেয়েছিলাম, তার মধ্যে একটি ছিল ফিকহ ও তার প্রয়োগ। আমি এ অঙ্গনে দুজন শাইখের নিকট পড়েছিলাম, সেখানে দেখা যায়, ৬৩টি জায়গায় স্কলাররা পরস্পর ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

এখানে যে বিষয়টি আমাদের বুঝতে হবে– তারা সকলে একই টেক্সট, একই বাক্য পড়েছেন, কিন্তু তাদের সকলের নিকট একই অর্থ প্রতিভাত হয়নি। আপনাকে বুঝতে হবে, একটি সাধারণ বিষয়ের অসংখ্য ব্যাখ্যা রয়েছে, একটি শব্দের পাঁচটি ভিন্ন উপলব্ধি রয়েছে, একটি বাক্যের ১২টি ভিন্ন উপলব্ধি রয়েছে। এমনকি নামাজ আদায়ের পদ্ধতিগত বিষয়েও মতানৈক্য রয়েছে। যেমন কিছু স্কলারের মতে, যখন আপনি ইমামের পেছনে দাঁড়িয়েছেন, তখন আপনাকে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। আবার অন্যান্য স্কলারের মতে, আপনি যখন ইমামের পেছনে দাঁড়িয়েছেন, তখন আপনার সূরা ফাতিহা পাঠ করার প্রয়োজন নেই। কারণ, ইমাম আপনার জন্য পাঠ করছেন, এটা গণনা করা হচ্ছে। এমনকি আমাদের নামাজের বিষয়েও মতানৈক্য রয়েছে। আর এই মতানৈক্যের কারণ হলো টেক্সট পড়ার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য। তাই আমাদের বুঝতে হবে, টেক্সট পড়ার সময় আমাদের কত বেশি বিনয়ী হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের কিছু ভাই, লিটারালিস্টরা (অক্ষরবাদী) মনে করেন, যখন আমি কুরআনের উদ্ধৃতি দিচ্ছি, তখন আল্লাহ তায়ালা কথা বলছেন। না, যখন আপনিই কুরআনের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, তখন কুরআনের আয়াতটি সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিক উপলব্ধিই ব্যক্ত করছেন। এ দুটো বিষয় ঠিক এক নয়।

এমনকি যখন আপনি কোনো কিছু বলছেন, তখন আপনি কেবল তা-ই বলছেন, সে সম্পর্কে যা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। এমনকি যখন আমরা ঈমান নিয়ে কথা বলি, কুফর নিয়ে কথা বলি, তখন আমাদের সবার উপলব্ধি একই থাকে না। এমনকি যখন আমরা ইসলাম নিয়ে কথা বলি, তখনও এ বিষয়ে আমাদের সবার উপলব্ধি একই হয় না। সুতরাং অন্যকে বিচার করার ক্ষেত্রে সতর্ক হোন, যখন সেখানে নতুন ব্যাখ্যা জড়িত আছে।

আপনি স্কলারদের দিকে লক্ষ করলে বুঝতে পারবেন, তারা এটা উপলব্ধি করেছেন– وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ অর্থাৎ "যারা জানে, যারা জ্ঞানবান", তারা কী বলেছেন? كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا আমরা জানি, "সবকিছু আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার পক্ষ থেকে আসে।"[4]

আল্লাহ তায়ালা সূরা আল ইমরানে বলেন,
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ
"তিনি সেই সত্তা, যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট (মুহকাম) যা কিতাবের মূল ভিত্তি। আর অন্যগুলো হলো রূপক (মুতাশাবিহ্)।"[5]

টেক্সট ও কনটেক্সটের[৬] মধ্যে সমন্বয়

কুরআনের কতক আয়াত সুস্পষ্ট, আর কতক ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত। কিছু মানুষ আছে যারা সব সময় বিভক্তি খুঁজে বেড়ায়। আর কিছু মানুষ বলে– হ্যাঁ, বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু সবকিছু কোথা থেকে এসেছে? আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, কুরআনের আয়াত হলো মুহকামাত ও মুতাশাবিহাত। এটা কাদের জন্য? পাঠকের জন্য। আর কীসে আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে? كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا "সবকিছু আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই আসে"[৭] এই মূলনীতি।

অতএব, উৎস এক, কিন্তু বিচিত্র ব্যাখ্যা আসে আমাদের থেকে। তাই এই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে খুবই সতর্ক হতে হবে। উসুলবিদরা প্রায়শ বলেন, টেক্সট বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব হলো আমরা বুঝতে চেষ্টা করি। আমরা টেক্সট উদ্ধৃত করি আর কিছু টেক্সট হলো সুস্পষ্ট। উসূলে ফিকহ-এর একটি নীতি হলো– لا اجتهاد مع النص তথা টেক্সট সুস্পষ্ট হলে তাতে ইজতিহাদের আর কোনো সুযোগ নেই। এটা আপনার সবাই জানেন। যখন টেক্সট হলো 'আকিমুস সালালাহ', তখন আপনার 'আকিমু' শব্দের ব্যাখ্যা করার কোনো সুযোগ নেই। 'আকিমুস সালাহ' মানে হলো আপনাকে দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে। এটা আমরা সবাই জানি। এটা সুস্পষ্ট।

তবে কখনও কখনও সুস্পষ্ট টেক্সট আপনাকে বুঝতে হবে কনটেক্সটের আলোকে (আপনি যে সমাজে বসবাস করছেন, সেই পরিস্থিতির আলোকে, সেই কনটেক্সটের আলোকে)। আপনারা উদাহরণ চান?

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
"চোর নারী-পুরুষ যেই হোক না কেন, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও।"[8]

সকল স্কলার বলেছেন, এটা সুস্পষ্ট নস। কিন্তু আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনে খাত্তাব রা. সুস্পষ্ট টেক্সট থাকার পরও দুর্ভিক্ষের কারণে সে সময় চোরের হাত কাটা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। সুতরাং বিশেষ কোনো কনটেক্সটের মুখোমুখি হলে, অস্বাভাবিক কনটেক্সটের মুখোমুখি হলে, আপনাকে থেমে যেতে হবে। কেন?

---

৪. সূরা আলে ইমরান : ৭

৫. প্রাগুক্ত;

৬. টেক্সট হলো কুরআন-হাদিস। কনটেক্সট হলো প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ-পরিস্থিতি।

৭. সূরা আলে ইমরান : ৭

৮. সূরা মায়িদা : ৩৮

কারণ, সুস্পষ্ট টেক্সট অস্বাভাবিক কনটেক্সটে হুবহু বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। তখন আপনাকে কনটেক্সটে বিবেচনায় নিতে হবে। আর আপনি যদি বিশেষ কোনো কনটেক্সটে সাধারণ টেক্সটি বাস্তবায়ন করেন, যেখানে কনটেক্সটি যথার্থ নয়, তবে বস্তুত আপনি টেক্সটের সাথে অবিশ্বস্ত আচরণ করলেন। তাই যদি টেক্সটি সুস্পষ্টও হয়, কিন্তু কনটেক্সট অস্বাভাবিক হয়, তবে কনটেক্সটের আলোকে আপনাকে টেক্সটে ফিরে আসতে হবে, আর সতর্ক হতে হবে। কারণ, সেখানে বহু ব্যাখ্যা রয়েছে।

এই উদাহরণে বুঝতে পারছেন, টেক্সটের অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। ব্যাখ্যা রয়েছে কনটেক্সটের, সামাজিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কর্মপদ্ধতির। এমনকি যদি কোনো বিষয়ে টেক্সট থাকে, তবে আমাদের যেভাবে শুরু করতে হবে তা হলো, আমরা নীতিমালার সাথে একমত, কিন্তু সেখানে রয়েছে কর্মকৌশল। মুসলিম হিসেবে আমাদের বিচিত্র ব্যাখ্যাক্ষেত্র রয়েছে। এমনকি টেক্সটের বিচিত্র ব্যাখ্যার বিষয়টি বোঝা দরকার। ঠিক একটু আগে আপনারা হাদিসটি ও তার ব্যাখ্যা শুনেছেন। তার একটি ব্যাখ্যা হলো, এমনকি যখন বলা হয় 'সত্তর', ক্লাসিক্যাল এরাবিকে 'সত্তর' মানে অনেক। এমনকি এর দ্বারা সত্তরের অধিকও বোঝায়। যেমন হাদিসে বলা হয়েছে, "রাসূল সা. দৈনিক সত্তরবার রাব্বে কারিমের কাছে তওবা করতেন।" এ দ্বারা আপনারা বোঝেন তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছে অনেক বেশি ক্ষমা চাইতেন। সত্তরবার মানে কাঁটায় কাঁটায় সত্তরবার নয়।

এখানে 'সত্তর' শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। আর এটা বুঝতে হলে আপনাকে আরবি ভাষা জানতে হবে। বুঝতে হবে আরবি সংস্কৃতিকে আর বুঝতে হবে বিশ্ব সংস্কৃতির হৃদস্পন্দন। আপনারা যুক্তরাষ্ট্রে এমন কিছু ইয়াং ওলামার ব্যাখ্যা পড়েন, যারা সাত দিনের শর্ট কোর্স করে আলিম হয়েছেন, তারা মানুষকে নির্দ্বিধায় কাফির ঘোষণা দেন। আমি মজা করছি না। তারা ভাসাভাসা জ্ঞান নিয়ে খুব দ্রুত মানুষকে ইসলামে থেকে বের করে দেয়। সর্বপ্রথম কাজ হলো নিজের অতি সীমিত জানাশোনা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া। কারণ, আপনি যত বিস্তারিত জানবেন, আপনার মন তত প্রশান্ত হবে এবং আপনার বুদ্ধিবৃত্তি মুক্ত হতে শুরু করবে।

বিচিত্র মন

আসুন আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি, কনটেক্সটের আলোকে টেক্সট অধ্যয়নকালে কোন বিষয়টি আমাদের মধ্যে মতভিন্নতা সৃষ্টি করে? প্রথম বিষয় হলো, আমাদের মন। ইমাম আবু হানিফা ও মালেক রহ.-এর দিকে লক্ষ করুন। ইমাম আবু হানিফা সম্ভাব্য সমস্যাও সমাধান করতেন। তিনি ভাবতেন, যদি এমনটা ঘটে তবে আমি টেক্সটের কী ব্যাখ্যা করব? তাই তিনি মূলত বিশ্বব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন এবং বিদ্যমান অবস্থা ও নতুন পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করতেন, যা তাকে টেক্সট ব্যাখ্যায় সহযোগিতা করতো।

অন্যদিকে ইমাম মালেক এমনটা ছিলেন না, তিনি বিশ্বব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন এবং বলতেন, আমি শুধু বিদ্যমান অবস্থা বুঝতে চাই এবং তার আলোকে তিনি টেক্সট ব্যাখ্যা করতেন। আপনি যদি এই দুটি ভিন্ন মাইন্ডসেটের পার্থক্য না বোঝেন, তবে আপনি বৈচিত্র্যের স্পন্দন বুঝতে পারবেন না।

একজন বলছেন, আমাদের কনটেক্সেটের খুবই কাছাকাছি হতে হবে এবং ভাবতে হবে, ভবিষ্যতে কী নতুন পরিস্থিতি উদ্ভূত হতে পারে। অন্যজন বলছেন, না, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিদ্যমান অবস্থা ও টেক্সটের মধ্যে সংগতিবিধান করা। ইমাম মালেকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সুনির্দিষ্ট করা ও ফোকাস করা। আর ইমাম আবু হানিফার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রসারিত করা ও উন্মুক্ত করা।

এর মানে কী? এর মানে দুটি ভিন্ন মনের অস্তিত্ব। তারা কি কখনও একে অন্যকে বলেছিলেন, তুমি আর মুসলিম নও? না, তারা কখনোই এমনটি বলেননি। এসব হলো বিচিত্র চিন্তা-প্রণালি (mindset)। আবু হানিফা ও মালেক রহ.-এর মাঝে যেমন চিন্তা-প্রণালির পার্থক্য ছিল, তেমনি আপনারা যারা এ এখানে আছেন, আপনাদের মাঝেও আবু হানিফা ও মালেকের মতো বিচিত্র চিন্তা-প্রণালি আছে। আপনাদের কারও চিন্তা-

প্রণালি (mindset) সুনির্দিষ্ট, আবার কারও বিশ্বকে দেখার প্রণালি ভিন্ন। এটাকে আপনাদের সম্মান করতে হবে।

ইসলাম কখনও মৃত মন নিয়ে সরল পথে চলতে বলে না

যতক্ষণ আপনি হেদায়াতের পথ অনুসরণ করছেন, ততক্ষণ ইসলাম আপনাদের বিচিত্র মনকে মর্যাদা দিচ্ছে। ইসলাম কখনও মৃত মন নিয়ে সরল পথে চলতে বলে না; বরং তা সরল পথের সজীব মনকে মর্যাদা প্রদান করে। বিষয়টা উপলব্ধির জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর সাথে সাইকোলজিও জড়িত। আপনার মনমানসিকতাও সর্বদা একরকম থাকে না। আপনি কখনও বজ্রকঠিন, কখনওবা ক্ষমার মহত্তম প্রস্রবণ। আপনি কখনও কঠোর থাকেন, কারণ, আপনি ভুল করেননি। আবার আপনি কখনও কোমল থাকেন, কারণ, আপনি পূর্বে ভুল করেছিলেন। এর সাথে সাইকোলজি সম্পৃক্ত। মনোবিদ্যা অনুসারে, আপনি কখনও একটি কখনও আরেকটি মত-পথের সাথে ঘনিষ্ঠতা অনুভব করেন। এভাবে সাইকোলজি বা মনস্তত্ত্ব পরিবর্তনশীল। তা হলে কীসে আমাদের বৈচিত্র্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে? আপনি যেই পরিবেশে বাস করছেন, সেই পরিবেশের ভিন্নতার কনটেক্সটটি আপনাকে বৈচিত্র্যের অনিকেত প্রান্তরে ধাবিত করছে।

আল ফিরকাতুন নাজিয়া

মাঝে মাঝে আপনার বুদ্ধিবৃত্তিক নীরবতা প্রয়োজন, আর প্রয়োজন হৃদয়ের প্রশান্তি। পরিবেশ ও মনের বৈচিত্র্য অপরিহার্যভাবে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাখ্যার উন্মেষ ঘটায়। এসব মানবীয় প্রবণতারই অংশ। এসব আল ফিরকাতুন নাজিয়ার-ই অংশ। আল ফিরকাতুন নাজিয়া অর্থ মুক্তিপ্রাপ্ত দল। এটা কোনো ছোটো দল নয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, আল ফিরকাতুন নাজিয়া হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত। সব ধারা থেকে আগত সত্যপন্থি লোকেরা এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই ধারার ব্যাপ্তি সুবিশাল। একটি মাত্র চিন্তা-প্রণালিতে তা সীমাবদ্ধ নয়। অতএব, তিনি বলতে চেয়েছেন, একটি ফেরকা অনেক বিস্তৃত। তাই আমাদের উন্মুক্ত হতে হবে। কেবল আমি ও আমার দলটিই সঠিক আর অন্যরা সবাই বাতিল– এরূপ সংকীর্ণ মত পরিহার করতে হবে। কারণ, আমরা টেক্সট পড়ছি আর বসবাস করছি একটি সুনির্দিষ্ট কনটেক্সটে। আল্লাহ তায়ালা জিকির অবতীর্ণ করেছেন, কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ইকরা'। 'ইকরা' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যার জন্য স্বাগত। ইকরা পরিভাষাটি ব্যাখ্যার সাথে সম্পৃক্ত।

ঐক্যবদ্ধভাবে জীবনযাপনের জন্য তিনটি শর্ত

মুসলিম হিসেবে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবনযাপনের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। যথা– ইখলাস, দক্ষতা ও সীমারেখাকে সম্মান করা।

প্রথমটি হলো ইখলাস; একনিষ্ঠতা ও মহৎ উদ্দেশ্য। তাই আপনারা অন্যকে ইসলাম থেকে বের করে দিতে পারেন না। কারণ, আপনি মানুষের একনিষ্ঠতা সম্পর্কে জানেন না। এটা ব্যক্তি ও তার রবের মধ্যকার বিষয়। যে বিষয়টি আমাদের সবার জানা দরকার তা হলো, কারও প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হবে সুধারণা নিয়ে। আপনি কেবল তখনই একজনকে বলতে পারবেন, তোমার নিয়ত খারাপ, যখন তথ্যসহ তা প্রমাণ করতে পারবেন। আপনার কাছে যদি প্রমাণ না থাকে, তবে তার প্রতি আমাদের মনোভাবের জন্ম হবে 'হুসনুজ জন' দিয়ে। 'হুসনুজ জন' অর্থ আমি তোমার প্রতি সব সময় সুধারণা পোষণ করি। এমনকি কোনো বিষয়ে তুমি আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করলেও। এ এক বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্যোতনা, যা দিয়ে আমাদের সূচনা করা প্রয়োজন। যারা আমাদের একই ধারার অনুসারী নয়, তাদের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গির প্রারম্ভ হবে সুধারণা নিয়ে।

অতীব গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় শর্তটি হলো দক্ষতা। আপনার জ্ঞানস্তরের দিকে লক্ষ করুন। আপনি না জানলে কখনও জাজ করবেন না। আর যদি জানেন, তবে আপনার নলেজ লেবেল অনুসারে জাজ করুন। এটি একটি শর্ত; যোগ্যতার শর্ত, অধ্যয়নের শর্ত। আমার শাইখের নিকট অধ্যয়নের পূর্বে বিস্তারিত বিষয়সমূহের উপলব্ধি থেকে আমার অবস্থান ছিল অনেক দূরে। যখন আপনি দক্ষতা অর্জন করবেন, তখন আপনার শাইখ বলবেন, তুমি এখন শিক্ষাদান করতে পারো। তিনি বলবেন, দুটি ভিন্ন বিষয়কে জাজ করার মতো দক্ষতা এখন তোমার অর্জিত হয়েছে। তার পূর্ব পর্যন্ত মুখ বন্ধ রাখুন।

আমাদের মুসলিমদের এই কথাটি বোঝা দরকার, আপনি কথা বলতে চান বিভক্তি নিয়ে, আর আশা করেন ঐক্য! এই সমাজে ঐক্যের জন্য আপনাকে প্রথমে যা করতে হবে তা হলো, চুপ থাকা ও নীরবতা পালন করা।

তৃতীয়টি হলো সীমারেখাকে সম্মান করা। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম এমন একটি দ্বীন, যার রয়েছে কতেক রুকন, আকিদা ও নীতিমালা। আর এতে রয়েছে হালাল ও হারাম। বৈচিত্র্যকে সম্মান করার নাম দিয়ে এখন কেউ যদি বলে আমি সীমারেখাকে উন্মুক্ত করব –একজন আমাকে যদি বলে আমি দৈনিক তিন ওয়াক্ত নামাজ পড়ি– আমি তাকে বলি খুব ভালো, কিন্তু এটা আর এখন একই ধর্মের মধ্যকার সংলাপ নয়, এটা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ (ভিন্ন ধর্মের মধ্যকার সংলাপ)।

আপনি যদি রুকনসমূহ পরিবর্তন করেন, তবে আপনি আর ইসলামে নেই। আমার নিকট একবার একজন আহমদিয়া অনুসারী আসেন। আমি তাদের হত্যা করাকে সমর্থন করি না; আমি বলি, কোনো সহিংসতা নয়। তিনি আমার নিকট এসে বলেন, আমি আপনার সাথে intra community dialogue (একই ধর্মের মধ্যাকার সংলাপ) করতে চাই। আমি তাকে বলি, দেখুন, আমি একজন মুসলিম। ইসলামের ধর্মবিশ্বাস হলো ছয়টি মূলস্তম্ভ। তার একটি হলো মুহাম্মাদ সা. সর্বশেষ নবি ও রাসূল। আমি তাকে বলি, আপনি কি মনে করেন মুহাম্মাদ সা.-এর পর আরও নবি আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তখন আমি বলি, এটা এখন আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, এটা আর একই ধর্মের মধ্যকার সংলাপ নয়। কারণ, এটা আমি যে দ্বীনে বিশ্বাস করি, তার সীমারেখার বাইরের বিষয়। এখন যদি আপনি মনে করেন এটা ইসলাম। তাহলে সেটা আপনার ধারণা। কিন্তু এটা আমার বিশ্বাসের সীমারেখাকে লঙ্ঘন করেছে।

সুতরাং সীমারেখা সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। স্কলারদের মতে– সীমারেখার ভিত্তি “আল-মা’লুম মিনাদ দ্বীন বিদদরুরা” অর্থাৎ দ্বীনের সুস্পষ্ট জরুরি বিষয়াবলি জানা। কোনটা অনুমোদিত আর কোনটা নিষিদ্ধ তা বোঝা। হালালকে হারাম, হারামকে হালাল বানানো যাবে না।

আমাদের তিনটি শর্ত রয়েছে– ইখলাস, দক্ষতা ও সীমারেখা। কেউ যদি আপনার নিকট এসে বলে জানো, কুরআন আল্লাহর বাণী নয়। তা হলে এটা ইসলামের সীমারেখার বাইরে। আমাদের সচেতন হতে হবে, আর এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, মাঝে মাঝে আপনি মনে করেন সীমারেখাসমূহ সম্পর্কে এসব মতামত মৌলিক, বিস্তারিত নয়। যেমন– যদি কেউ একটি বিষয়ে একমত না হয়, তখন হুট করে বলে বসা হয় এটা কুফরি। কুফরি মানে হলো আপনি আর ইসলামে নেই, আপনি আর মুসলিম নন। কিন্তু সতর্ক হোন, কুফরের অনেক প্রকার রয়েছে– কুফরিল আকবার, কুফরিল আসগার, কুফর বিদুন কুফর। স্কলাররা কুফরের স্তর বিন্যাস করেছেন আর আপনি কিনা হুট করে কাফির ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছেন। আপনি তাৎক্ষণিক এভাবে কাউকে বলতে পারেন না যে, “তুমি কাফির; কারণ, তুমি আমার সাথে একমত নও।” যদি সেটা মৌলিক নীতিমালার বিষয়ে হয়, তবে সে ইসলামের বাইরে চলে যায়। তবে সেটা ভিন্ন ধরনের আলোচনা– কিন্তু তাতে থাকবে অপরের প্রতি সম্মান, তবে সীমারেখা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা। তা-ই মুসলিম হিসেবে আমাদের সীমারেখা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখা প্রয়োজন এবং এ সম্পর্কে আরও অধিকতর উপলব্ধির প্রচেষ্টা দরকার।

ইসলামের গৃহীত বৈচিত্র্য

সত্তরের দশকের শুরুতে আমার লেখা একটি বইয়ের আলোচনা করে বক্তব্য শেষ করব। এটা সমগ্র পাশ্চাত্য সমাজ ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ব্যাপক পঠিত হয়। Radical Reform-এ আমি পাশ্চাত্যের মুসলিম ও ইসলামের ভবিষ্যৎ অথবা ইউরোপীয়ান মুসলিম হওয়া– এসব নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি এটা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি। আমি বলেছি দেখুন, যখন আমরা ইসলামে প্রবেশ করছি, মুসলিমদের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছি, তখন মুসলিম হিসাবে ইসলামের অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের অধিকতর বোঝাপড়া থাকা প্রয়োজন এবং ইসলামে রয়েছে অনুমোদিত বৈচিত্র্য।

আজকাল মিডিয়া মুসলিমদের দু'ভাগে ভাগ করছে। ভালো মুসলিম ও খারাপ মুসলিম। এটা মুসলিমদের সম্পর্কে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি। ঔপনিবেশিক সময়ে খারাপ মুসলিম বলতে বোঝানো হতো যারা উপনিবেশনকে প্রতিরোধ করেছিল। আর ভালো মুসলিম ছিল তারা, যারা তাদের সহযোগিতা করেছিল।

মুসলিম হিসেবে এটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঠ, খুবই তাৎপর্যবহ পদক্ষেপ। আমাদের ধারাসমূহ সংজ্ঞায়ন করতে হবে এবং বলতে হবে, ইসলামের মধ্যকার কোনো পদ্ধতির আলোকে ও কীসের ওপর ভিত্তি করে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইসলামে অনেক ধারা রয়েছে। বস্তুত, আমি পূর্বেও যা বলেছি এসব ধারা টেক্সট থেকে উদ্ভূত। যেহেতু এটা টেক্সট থেকে আসছে, তাই আপনাকে মনন ও টেক্সটের মধ্যকার সম্পর্কের প্রতি লক্ষ করতে হবে।

ইসলামে কমপক্ষে পাঁচটি মূল ধারা রয়েছে। সবগুলোই হলো 'মিনাল উম্মাল ইসলামিইয়্যা' তথা ইসলামে গৃহীত বৈচিত্র্য। এতে কোনো সমস্যা নেই।

এক. আক্ষরিক ধারা

অক্ষরবাদীরা কোনোকিছু পড়ার সময় তার লিখিত রূপের প্রতি জোর প্রদান করে। আমাদের নিকট এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম রা. বনু কোরায়জা যাওয়ার সময় রাসূল সা. বলেছিলেন, তারা যেন সেখানে পৌঁছার পূর্বে সালাত আদায় না করে। তখন আক্ষরিক ধারার লোকজন উপলব্ধি করেছে সালাতের সময় হওয়া সত্ত্বেও রাসূল সা. যেহেতু নিষেধ করেছেন, তাই আমারা সালাত আদায় করব না। এটা গ্রহণযোগ্য।

কিছু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে ও বিশ্বব্যাপী, এমনকি এখানে আমাদের সালাফি ভাইয়েরা আছেন। এতে কোনো সমস্যা নেই। তারা অক্ষরবাদী। আর মাঝে মাঝে আমাদের তাদের প্রয়োজন। কেন জানেন? কারণ, সালাফি ভাই ও বোনেরা টেক্সটকে সতর্কতার সাথে গ্রহণ করেন এবং তারা টেক্সট নিয়ে খেলেন না। এটা খুবই ভালো। আপনাকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার এমন কিছু লোক থাকবে– "সতর্ক হও, বিশ্ব তোমাকে প্রলুব্ধ করছে আর টেক্সট তোমাকে সঠিক পথ বাতলে দিচ্ছে। অতএব, টেক্সটে ফিরে এসো।" প্রত্যেকটি ট্রেন্ডে গ্রহণযোগ্য কিছু ভালো দিক আপনি খুঁজে পাবেন।

দুই. মাজহাব অনুসারী ধারা

আপনি আবার এমন একটি ধারা দেখতে পাবেন, যারা একজন ইমামের ও একটি মাজহাবের অনুসরণ করেন। ইমামরা ছিলেন অগাধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী এবং তারা মাজহাব প্রবর্তন করেছেন। যেমন ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানিফা রহ. প্রমুখ। শুরুতে ১৮টি মাজহাব ছিল। এতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, তারা এমন মহান ইমামের অনুসরণ করে নিশ্চয়তা অনুভব করেন, যিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করেছেন এবং একটা প্রণালি তৈরি করেছেন। আর এই প্রথা আপনাকে মূলের সাথে কানেক্ট করছে এবং ভিত্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। আপনি মাজহাবের অনুসরণ করতে পারেন– এতে কোনো সমস্যা নেই।

আমরা সকলে সেই মহান ইমামদের কাউকে না কাউকে গ্রহণ করি। আমরা এখনও কেউ হানাফি, শাফেয়ি, হাম্বলি ও মালেকি মাজহাব অনুসরণ করছি। আমাদের অনেক ট্রেন্ড (ধারা) রয়েছে। এতে কোনো সমস্যা নেই। এমনকি সালাত পড়ার ধরন নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। আমাদের পরস্পরকে সম্মান করতে হবে। মাজহাবি লোকদের ভালো দিক হলো, তারা বলে– "দেখুন, আমি শুধু টেক্সট পড়ি না; আমার একটা সমৃদ্ধ ঐতিহ্যও আছে। আমার পূর্বে এ বিষয়ে সুগভীর চিন্তাভাবনা করেছেন এমন অনেক স্কলার আছেন। সুতরাং আমি একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী"– এটা ভালো।

তিন. রিফর্মিস্ট (সংস্কারক) ধারা

আমাদের আরও আছে রিফর্মিস্ট (সংস্কারক) ধারা। সংস্কারক ধারা হলো, তারা টেক্সটের প্রতি মনোনিবেশ করেন, গ্রহণ করেন এবং টেক্সটের মূল বিষয়বস্তু বিবেচনা করেন। কিন্তু একই সময়ে তারা ইজতিহাদকেও গ্রহণ করেন। তারা বিবেচনা করেন টেক্সটের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মূলত কী ছিল।

আমি যে ঘটনা উল্লেখ করেছিলাম, এরা তার দ্বিতীয় গ্রুপের উত্তরাধিকার। তারা রাসূল সা.-এর নির্দেশ, "তোমরা বনু কুরায়ায় পৌঁছার পূর্বে সালাত আদায় করবে না।" তারা এর অর্থ নিয়েছিলেন এ কথা দ্বারা রাসূল সা. সেখানে দ্রুত পৌঁছতে বলেছেন; সালাত পড়তে বারণ করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি মূলত দ্রুততা বুঝিয়েছেন। এভাবে তারা টেক্সটের উদ্দেশ্যগত অর্থ নিয়েছেন। তারা রিফর্মিস্ট। তারা প্রাসঙ্গিক কনটেক্সটকে বিবেচনার চেষ্টা করেন। এটা ভালো। যতক্ষণ পর্যন্ত ইখলাস, দক্ষতা এবং পরিসীমার (হালাল-হারাম) প্রতি সম্মান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এতে কোনো সমস্যা নেই।

চার. যুক্তিবাদী ধারা

আরেকটি ধারা হলো যুক্তিবাদী ধারা। তাদের ভাষ্য, সহিহ টেক্সট অবশ্যই যুক্তিগ্রাহ্য হবে; আর যা অবোধগম্য তা গ্রহণযোগ্য নয়। মাঝে মাঝে আমাদের যুক্তিতে সবকিছু গ্রহণযোগ্য মনে হবে না, কিন্তু টেক্সটি খুবই শক্তিশালী। যুক্তিবাদী ধারার একটি উদাহরণ হলো মুতাজিলা। তবে তাদের কতক খুব আন্তরিক মুসলিম ছিলেন। তারা টেক্সটকে বুঝতে চেষ্টা করতেন। তাদের বক্তব্য ছিল, কোনো কিছুই বোধের অতীত নয়। তারা বুঝতে চেয়েছিলেন এবং যুক্তিকাঠামো তৈরি করেছিলেন। তাদের কতক এমনও বলেছেন– যদি সেখানে কোনো যুক্তি না থাকে, তবে এটাও একটা যুক্তি (যুক্তি না থাকাটাও একটা যুক্তি)। তারা হলেন যুক্তিবাদী ধারা।

পাঁচ. সুফিবাদী ধারা

আমাদের আরেকটি ধারা হলো সুফিবাদ। তারা টেক্সট পড়েন তবে তারা টেক্সটের প্রাথমিক অর্থে থেমে যেতে চান না; তারা হৃদয়কে আলোকিত করতে অর্থের গভীরে যেতে চান।

অন্যকে বিচার করবেন না

আপনি এ সকল ট্রেন্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাবেন, সকল ধারা থেকে গ্রহণ করার মতো কিছু না কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে। আর আপনি যদি মুসলিম হন, মানুষকে বিচারের পরিবর্তে –যে তুমি এই ধারার অনুসারী, আমি ওই ধারার অনুসারী– তাদের থেকে আপনি ভালোটা গ্রহণ করবেন এবং নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নেবেন, কোথায় আপনি অধিকতর স্থিরতা ও প্রশান্তি অনুভব করেন।

ইমাম আবু হামিদ আল গাযালি বলেন,

"সেটাই আপনার পথ, যা আপনার হৃদয়ে প্রশান্তি আনে। কিন্তু সাবধান! অন্যকে বিচার করবেন না।"

তবে কথিত কতেক লিবারেলদের (উদারপন্থি) বিষয়ে সতর্ক হোন। কারণ, এটাকে যেহেতু আমি ৬ষ্ঠ ট্রেন্ড হিসেবে উল্লেখ করছি। উদারপন্থা নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই, যদি তারা হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল না বানায়। এটাই হলো সমস্যা; কারণ, কতিপয় লিবারেল এমন ইসলামকে উপস্থাপন করছে, যাতে ইসলামের নাম-গন্ধও নেই। এটা এক ধরনের নতুন ইসলাম। 'আলোকিত ইসলাম' (Enlighted Islam), তাদের ভাষায়। আমাদের এই বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

পারস্পরিক সংযোগ ও খোলা মন

পথটি প্রশস্ত। জীবনযাপন পদ্ধতি– শরিয়াহ। পথটি প্রশস্ত আর তাতে রয়েছে সরলপথে চলার বিভিন্ন পদ্ধতি ও পন্থা। এটাকে আমাদের সবার সম্মান করতে হবে। এটা পূর্বেও বলা হয়েছে, বিনয়ী থাকো, অহংকার করো না। বিনয় মানে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। অহংকার না করা মানে অন্যকে বিচার না করা।

দ্বিতীয়ত, সম্মান এবং খোলা মন। আমি আপনাকে সম্মান করি এবং আমি উদার। অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পারস্পরিক সংযোগ ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ। মানুষ আপনাকে কি বলছে তা শোনা। আমি সালাফিদের দরসে বসেছি। অনেক বিখ্যাত স্কলারকে তথা ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে তারা সালাফি হিসেবে অথবা সালাফিদের রেফারেন্স হিসেবে উপস্থাপন করেন। অথচ জানেন, ইমাম ইবনে তাইমিয়া নিজে সুফিও ছিলেন। এভাবে আপনি একই সাথে অনেকগুলো ট্রেন্ডকে ধারণ করতে পারেন। একজন সংস্কারক ও সুফি ইমামকে অনুসরণের মাধ্যমে আপনি একজন সুফি-সংস্কারক হতে পারেন। এটা অলৌকিক কোনো বিষয় নয়, বরং এমনটাই হওয়া উচিত।

আমি আমার বই Arab Awekening-এ লিখেছি এটি একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। আমি চাই আপনারা এটা বোঝেন। কারণ, আমি সত্যিই এ বিষয়ে সতর্ক হতে জোর প্রদান করছি। বিশ্বব্যাপী শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে যা ঘটছে, তা একটা চরম বিপর্যয়। বর্তমানে সিরিয়ায় যা ঘটছে– আপনি-আমি, আমাদের সবাইকে মজলুমদের পাশে দাঁড়াতে হবে। বিরোধী শক্তির পেছনের ইন্ধনদাতাদের বিষয়ে আমাদের যেমন সরল হওয়া চলবে না, তেমনি বাশার আল আসাদের বিষয়েও সরল হওয়া চলবে না, কারণ সে একজন স্বৈরাচারী। আমাদের এটা বোঝা দরকার, তারা আমাদের শিয়া-সুন্নিতে বিভক্ত করছে। আমি মনে করি এটা একটা বিপর্যয়। আমরা এই বিভক্তিকে এখানে আমদানি করব না, বরং আমাদের উচিত ঠিক এর বিপরীত করা।

মর্যাদাসম্পন্ন কণ্ঠের বিচিত্রতা

আমাদের একসাথে, একটি কণ্ঠস্বর হতে হবে। একটি কণ্ঠস্বর হওয়া মানে অভিন্নতা নয়, এর মানে হলো মর্যাদাসম্পন্ন কণ্ঠের বিচিত্রতা। আমরা এটাকে গ্রহণ করেছি। আমি মরিশাস থেকে আসার পর এক শাইখ আমার সম্পর্কে বলেছেন– তারিক রমাদান কাফির, মুরতাদ। কারণ, একটি ইস্যুতে আমি তার অবস্থানের সাথে একমত হইনি।

আমি মনে করি, আমাদের খুবই সতর্ক হতে হবে। আপনারা জানেন মিশরে এখন কী ঘটছে– এক স্কলার অন্য স্কলারের সাথে কোনো বিষয়ে একমত না হলে অন্যজন কি বলে বসে জানেন? ওমুক স্কলারের স্মৃতিভ্রষ্টতার (এলজাইমার) রোগ আছে। এটা লজ্জাজনক। এটা এমন স্কলারশিপ নয়, যা আপনি অনুসরণ করতে পারেন। তাত্ত্বিক পর্যায়ে আমাদের এটা বন্ধ করতে হবে। মিশরে কিছু ট্যাক্সিতে স্টিকার সাঁটা হয়েছে– এখানে কুকুর উঠানো নিষিদ্ধ, ধূমপান নিষিদ্ধ ও ইখওয়ান উঠা নিষিদ্ধ। হ্যা! এটা ট্যাক্সিতে লেখা ছিল। আপনি যদি এই

পর্যায়ে পৌঁছে যান, তবে এটা ভুল, এটা অত্যধিক প্রান্তিকতা। আমাদের যৌক্তিকতা, প্রজ্ঞা, নম্রতা, অন্যের প্রতি সম্মান, উন্মুক্ততা ও সংলাপে ফিরে আসতে হবে।

আল্লাহ তায়ালাই সবচেয়ে বেশি জানেন, তিনিই উচ্চতম, তিনিই সবচেয়ে প্রজ্ঞাময়। আমাদের সকলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।